আচার্য্য বাণী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংগ্রহ

সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

'আচার্য' উপাধিটি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামের অগ্রভূষণ করে যে ব্যবহার প্রচলিত, এমনতর বিশেষণটি সম্ভবত তাঁর নামের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি মানানসই। তাঁর আচরণ এখনও নিত্যস্মরণীয়, অনুক্ষণ অনুকরণযোগ্য বলেই আমাদের বিশেষ করে মনে হয়। বিশেষত বাঙালি জাতির বর্তমান দশার পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই।

তিনি বাঙালির গৌরব, গৌরবমণ্ডিত বিজ্ঞানী। তাঁর বিজ্ঞানচর্চা, তাঁর ছাত্রবাৎসল্য, তাঁর সহজ সরল জীবন, কৌতুকপ্রিয়তা, সংযম এবং দেশপ্রাণতা— আরাধ্য বিষয়। এসমস্ত গুণই তাঁর রচনাবলিতে আশ্চর্য দ্যুতিময়তায় বিচ্ছুরিত। বিজ্ঞান তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা তাঁকে আমাদের পরমাত্মীয় করে তুলেছে। তিনি দিগদর্শক এবং দিকনির্দেশকও। এখানে তিনি ভাবুক এবং পরিকল্পক। কর্মী এবং অভিভাবক।

কর্মই তাঁর জীবনবাণী। Journal of Asiatic Society of Bengal-এ Mercurous Nitrate বিষয়ে তাঁর গবেষণা যখন জগৎবিস্তারী খ্যাতি অর্জন করে আনল— তখন তিনি নিমগ্ন ছাত্র নির্মাণে, যে ছাত্রধারা তাঁর কর্মভাবনাকে সমাজে প্রাগ্রসর করে দেবে। আবার তিনি একদল কর্মীও গঠন করে নিলেন ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের ছোটো অন্ধকার বাড়িতে বসানো কারখানার সহযোগী হিসেবে। তিনি সেখানে স্থাপন করেছেন বেঙ্গল কেমিক্যালের সাধের কারখানাটি। মূলধন মাত্র আটশো টাকা— The Bengal Chemical & Pharmaceutical Works had its birth and early struggles in the dark and dingy rooms of a house in Upper Circular Road, and it started with a modest sum of Rs 800.'—আচার্য নিজেই লিখে গেছেন।

একাজ কখন তিনি করলেন? তাঁর ভাষাতেই বলি— "এখন একটা Capital-এর (মূলধনের) কান্না শোনা যায়। কিন্তু পাশ-করা ছেলের পক্ষে এটা শোভা পায় না; কারণ এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে রিসার্চ করছেন এমন কোন যুবককে দশহাজার টাকার তোড়া দিলে ছ'মাসে তা' খরচ ক'রে আর দশহাজার টাকা ধার ক'রে বসবেন।' (তাঁর 'অন্নসমস্যা' প্রবন্ধ) এঁদেরই প্রতিবাদ সতীশচন্দ্র সিংহ— এম-এ পাশ করে প্রফুল্লচন্দ্রের সহযোগী হয়ে গিয়েছিলেন, ভুল করে হাতে প্রুসিক অ্যাসিড ঢেলে ফেলে মারা যান। কিন্তু বাঙালি উদ্যোগীদের কাছে তাঁর প্রাপ্য হয়ে গেল শহিদের মর্যাদা। আর আচার্য রায় লিখছেন কী, একবার পড়ে নিই— "২৭/২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি, তখন কুলীর মত খেটেছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০৲ টাকা জমিয়ে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি— আজ তার মূলধন ২৫/২৬ লক্ষ টাকা।' বাঙালি উদ্যোগীর এতো বড়ো উদাহরণ সেকালে দুর্লভ ছিল। এই যে নিজে নিজে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন, তাতেই আরও পাঁচজন শিক্ষিত-শিক্ষার্থীকে আহ্বান করার সামর্থ্যও অর্জন করে নিলেন। বাঙালির 'অন্নসমস্যা' কে দশের সামনে তার যথার্থ স্বরূপ উপস্থিত করে তা থেকে উদ্ধারের পথও বাৎলে দিলেন। যে শিক্ষা কেবল মেরুদণ্ডহীন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে, মনুষ্যত্বের সঙ্গে যা সম্পর্কহীন— সে শিক্ষার অসারত্ব সোচ্চারে ঘোষণা করে তিনি বাঙালি যুবককে ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং শিল্প শিক্ষায় আগ্রহী হতে আহ্বান জানালেন নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়— তার উপদেশ সারশূন্য ছিল না।

এই সব জীবন্ত ও জ্বলন্ত সমস্যা সামনে রেখে তিনি এই যে নানা ভাষণ-প্রতিভাষণ দিতেন তা বহুক্ষেত্রেই সাহিত্যগুণোপেত থাকত। এছাড়া সমাজ-শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়েও তিনি নানা সময়ে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করতেন, নানা পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হত। আচার্যদেব বাংলায় গ্রন্থাদি রচনা করেও তাঁর ভাবনা ভাষায় রূপান্তরিত করে গেছেন। তাঁর 'বিজ্ঞানী' পরিচয়, তাঁর সাহিত্য-পরিচয়কে আবৃত করে গেছে, নইলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর জন্যে একটা অধ্যায় নির্দিষ্ট থাকার কথা। আপন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে তিনি এতোখানিই নিশঙ্ক ও নিঃসংশয় ছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও বিতর্কে তিনি পিছপা হননি। জাতিকে উন্নত করার উপায় যে স্বভাষায় সাহিত্যরচনা— এটা ছিল তাঁর দৃঢ় প্রতীতি। রামনিধি গুপ্তের কবিতা উদ্ধার করে তিনি প্রায় বলতেন—

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা
মিটে কি তৃষা?

এজন্যেই, কিছুটা দেরিতে হলেও বাংলায় তিনি প্রথম রচনা করলেন 'প্রাণী-বিজ্ঞান'— ছোটো বই, ছাত্রদের মুখ চেয়ে লেখা, একেবারেই দুষ্প্রাপ্য এখন। এরপরে লিখলেন 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার'। এটি প্রকাশমাত্রই বঙ্গসমাজে গভীর আলোড়ন উপস্থিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন বাঙালির প্রতিভা আছে কিন্তু তা সঠিক পথে বিকশিত-পরিচালিত হচ্ছে না। বঙ্কিমচন্দ্রও এ-বিষয়ে পথ নির্দেশ দিতে পারেন নি। সেজন্যেই এই বই লেখা। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখে গেছেন—"যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিভব-সম্পত্তি হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্বপুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ।" বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কিছুটা এমনতর ছিল। তাই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন— "বঙ্কিমবাবুর একটা লেখা পড়ে' আমি এই সন্দর্ভটি লিখি। এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণীয় বাঙ্গালীর উল্লেখের সময় রঘুনন্দন, কুল্লুকভট্টের নাম করে' বলেছেন— 'অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন-প্রসবিনী।' এ মত আমি সমর্থন করতে না পেরে, এ মতের বিরুদ্ধে এই বইখানা লিখি। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে খুব বড়— আমি স্বীকার করি; তাঁর প্রতিভা যে সেদিকে খুব বিস্তার লাভ করেছিল— মানি। কিন্তু তাঁর ও কথা মানি না— কারণ আমি জানি, বাঙালীর বিদ্যা-বুদ্ধি ঐ দিকে নিয়োজিত হওয়াতে আমাদের কতটা জাতীয় অধঃপতন ঘটেছে। সেই জন্য ঐ কথার প্রতিবাদ করে' আমি এ বইখানা লিখি।"

সেই প্রতিবাদের ভাষা ছিল এই প্রকার—

"এখন বিবেচনার বিষয় এই যে, আজ বর্ত্তমান জগতের ভীষণ জীবন-সংঘর্ষের দিনে আপনাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের টোলে প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরায় ন্যায় ও সাংখ্যের গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে হইবে? আমরা আজ কালবারিধি তীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গমালা গণিয়া হতাশ মনে গৃহে ফিরিব? অথবা নিরাশার তীব্র দংশনের ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত ভাবিব,— বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা ও দীক্ষা ভ্রান্তিমূলক, উহা মানবহৃদয়ে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা জনন করিয়া সুখ, শান্তি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার পথ কণ্টক সমাকীর্ণ করে?...

"স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবন-নদের উৎস। এই উৎস যে দিন হইতে শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালী জাতির অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সহস্র বৎসর কাল এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত আলস্য এবং অন্ধবিশ্বাসরূপ গভীর কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনের প্রস্রবণকে রুদ্ধ করিয়াছে।"

এর ফল হল মারাত্মক—

"হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ভিন্ন সকলজাতি ম্লেচ্ছ ও বর্ব্বর, তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখবার নাই, এই প্রকার সংস্কারসকল যে দিন আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রবল অধিকার স্থাপন করিল, সেই দিন হইতে আমাদের উন্নতির মার্গ কণ্টকিত হইল। সেই দিন হইতে হিন্দুজাতি কূপমণ্ডূক

হইল, অহঙ্কার ও আত্মাদরে স্ফীত হইয়া জগতের শিক্ষা ও জগতের দীক্ষা তৃণজ্ঞান করিয়া অলক্ষিতভাবে অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইল।"

সেই যুগের অবসান ঘটেছিল একসময়। এর পরে নতুন একটা যুগ এল, বাঙালির কাছে অন্য এক সুযোগ এসে উপস্থিত হল। কিন্তু বাঙালি মেধা দিয়ে তাকে কাজে লাগাতে পারল না। প্রফুল্লচন্দ্র লিখলেন—

"এই সময়ে বাঙালী কেরাণীর সৃষ্টি ইংরাজ বণিক প্রজাপতির কৃপায় আরম্ভ হইল। ইংরাজ বণিক বাঙালীর সহায়তা ভিন্ন ব্যবসায় চালাইতে পারিতেন না; ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদান প্রথমতঃ প্রায় সমস্তই বাঙালী কেরাণীর হাত দিয়াই হইত। অনেক নিরক্ষর হৌসের মুৎসুদ্দিরা এই সুযোগে ক্রোড়পতি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অশিক্ষিতের হাতে বিপুল ঐশ্বর্য্যের আগমনে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্ররোচনায় ও স্বাচ্ছন্দের বাতাসে বিলাসিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল— কর্ম্মক্ষম হইয়াও বাঙালী স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে গুজরাট, রাজপুতানা (বিকানীর) ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সমস্ত ব্যবসা-দখল করিতে লাগিলেন, আর বাঙালী ধ্রুবতারার ন্যায় কেরাণীগিরি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন।"

তাঁর এই প্রবন্ধ পড়ে সে সময়ে তাঁর নিন্দাবান্দা করে নানান লেখা বেরিয়েছিল। কিন্তু তিনি মত পরিবর্তন করেন নি। কারণ তাঁর সমালোচনা ধ্বংসাত্মক ছিল না, ছিল গঠনাত্মক। প্রতিভাধর বাঙালিকে তিনি পথ দেখাতে চেয়েছিলেন।

'অন্নসমস্যা' বইটি তাঁর অন্যতম সেরা রচনা বলে সমসাময়িক কাল বরণ করে নিয়েছিল। হাওড়া প্রদর্শনীতে সভাপতির বক্তব্য হিসেবে এটি তিনি প্রদান করেন। এর অন্য অংশগুলি এলবার্ট ইন্সটিটিউটের অধিবেশনে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রদের কাছে নিবেদন করেন। এই সব অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন আশুতোষ চৌধুরি। এখানেও পূর্ববর্তী বক্তব্যের পুনরুদ্ধার ঘটেছে—

"আপনারা সকলেই জানেন সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের কথা— যেখানে বাঙালীর ছেলে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী চর্চ্চা আরম্ভ করে। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি থেকে বরাবর আজ পর্য্যন্ত আমরা চলেছি— একভাবে একই বাঁধাপথে। এই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলবার কালে এখন একবার উচ্চ স্বরে বলে উঠ্‌তে হবে— 'থামো, থামো'।...

"চাকরীর বাজার আগে ভাল ছিল বটে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে ইংরাজী শিখে বাঙালী চাকরীই করছে। শিক্ষিত যুবক আগে মুন্সেফ ডেপুটি হতে পারতেন— গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী অফিসে নানারকম কাজকর্ম্ম জুটত। ইংরেজ যখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বর্ম্মায় রাজ্য বিস্তার করলেন— তখন বাঙালী সেখানেও গেল চাকরী করতে, আর মাড়োয়ারী, বোম্বেওয়ালা প্রভৃতি গেলেন ব্যবসা করতে। ডিগ্রী থাকলে চাকরীর বড় সুবিধা হত, তাই তখন ডিগ্রীর একটা অকৃত্রিম মূল্য হয়েছিল। আর সেই কারণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীই একধ্যান একজ্ঞান হয়ে উঠল। কিন্তু এখন শিক্ষিতের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এত চাকরী জুটবে কোথা থেকে? অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য করতে না পারলে ঘটনাচক্রের পেষণে মরতে হবে আমাদেরই। সুতরাং চাকরীর পথ ছেড়ে অন্যপথ ধরতে হবে।"

এখানে তাঁর একটি মন্তব্য নিয়ে মহাবিতর্ক শুরু হয়। 'আইন' পড়া নিয়ে তিনি অনুৎসাহী হয়ে পড়েন এবং এতে উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খুবই আহত হন। তিনি বলেছিলেন—

"আমায় যদি কেউ একদিনের জন্যও কলকাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা (Dictator) করে, তবে ল-কলেজটিকে আমি আগে ভূমিসাৎ করি; অন্ততঃ দশবছরের জন্য আইন পড়া উঠিয়ে দিই। কারণ তা হ'লে উপোসী উকিলদের অন্ন হতে পারে। আর ব্যাধির শেষ কি এইখানে? এদেশের ছাত্র বি-এল পাশ করে' ভাবেন, এম-এল হবেন। যেন বিধাতা তাঁদের সৃষ্টি করেছেন শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে' পরীক্ষা পাশ করতে এবং যমসদনে যেতে।"

স্যার আশুতোষ ক্ষুব্ধ হলে প্রফুল্লচন্দ্র বলেন—

"বড়ই দুঃখের বিষয়, আমার বক্তব্যের উল্টা মানেই অনেকেই করেছেন। আইনজ্ঞেরা আমার শত্রু, এমন উৎকট অদ্ভুত কথা আমি বলিনি। বাংলার ব্যবহারজীবীদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, ডবলিউ, সি. ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃগণ, কলিকাতা সায়ান্স কলেজের প্রাণস্বরূপ স্যর তারকনাথ ও স্যর রাসবিহারী এবং মনস্বী জষ্টিস্ চৌধুরী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও সি. আর. দাশ প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণ বাংলার সকল শুভকার্য্যে অগ্রণীস্বরূপ। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিজ্ঞ ব্যবহারজীবীর স্থান কোথায় মহামতি বার্ক তা অতি সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করে' গেছেন। কিন্তু ছোট বড় সকল প্রকার আদালতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েও যাঁরা উপোস করে' থাকতে বাধ্য হন, বার লাইব্রেরীর চাঁদার পয়সাটা যাঁরা দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না এবং স্থল বিশেষে এক ছিলিম তামাক পেলে যাঁরা কয়েক পাতা নকল করে' দিতে পারেন, এমন উকিলরা কি ওকালতি ব্যাপারটার মর্য্যাদা হানি করছেন না? তাই বল্‌ছিলাম— উকিল তৈরী করবার কলটা যদি বেশ কয়েক বৎসর বন্ধ থাকে, তবে গোবেচারী উপোসকারীর দল বেঁচে যেতে পারে। প্রয়োজন ও আয়োজনের মধ্যে অসামঞ্জস্য কত বেশী হ'য়ে পড়েছে বিবেচনা করে দেখা উচিত। তা হ'লে দফ দফে উকিল তৈরী করে' তাদের দফা-রফা করবার প্রবৃত্তি হবে না।"

এমন বিতর্ক ওঠে বার বার যখন তিনি বাঙালি যুবকদের ব্যবসাক্ষেত্রে আসার আহ্বান করে, কলকাতায় মাড়োয়ারিদের প্রসারের ভূমিকাকে বার বার 'তিরস্কার' করেন। তিনি বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসাক্ষেত্রে বড় হয়েছেন তাঁদের উদাহরণ দিয়েছেন, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আলামোহন দাসদের জীবনী রচনা করে— সেই উদাহরণকে বিস্তারিত করেছেন—

"স্যার রাজেন্দ্রনাথ, জে. সি. ব্যানার্জ্জী, কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী এন. সি. সরকার, রেলওয়ে ট্রাফিকের এস. সি. ঘোষ— এঁরা উপাধির ধার ধারেন না। জে. সি. ব্যানার্জ্জীর কৃতিত্ব বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বোম্বাই পুণা প্রভৃতি স্থানে পৌঁছেচে। সেখানে এখন এককোটী টাকার কণ্ট্রাক্ট তাঁর হাতে। বাঙালীর বোম্বাই প্রদেশে এই প্রথম প্রতিষ্ঠা; আমাদের পক্ষে এ বড় গৌরবের কথা।"

কিন্তু মাড়োয়ারিদের সমালোচনার কারণে ক্ষুব্ধ সেই সমাজসম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— তাঁদেরকে দুঃখ দেবার বা অপমান করার কোনো ইচ্ছে তাঁর ছিল না। তাঁদের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন— বাইরে থেকে কর্পদকহীন অবস্থায় এসে তাঁরা কীভাবে এদেশে বেড়ে উঠছেন, অথচ এদেশীয় বাঙালিরা পারছেন না কেন?

॥ ৩ ॥

আমাদের সমাজে 'জাতিভেদ' একটা বড় যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা। তাই তার প্রতিবাদ করে প্রফুল্লচন্দ্র 'জাতিভেদ-সমস্যা' গ্রন্থে লিখলেন—

"স্বীকার করতেই হবে যে, জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি, অধঃপাতে গেছি; এতই অধঃপাতে গেছি যে, আবার ধর্ম্মের অজুহাতে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এই প্রথাকে— বিশেষতঃ এই ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারটিকে, বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ না করে' ছাড়ছি না।"

এর ফলেই সমস্যাটা জটিলতর হয়েছে। "পাতিত্য সমস্যা" রচনায় তাই তীব্রতর আক্রমণ করে লিখে গেছেন—

"আমরা দেশকে মা বলি। যাঁর লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা যদি বাংলাকে মা বলেন, তবে কি সকলকে ভাই বলে" আলিঙ্গন করবেন না— মায়ের সন্তানকে পদাঘাত করে' দূরে ঠেলে কি তাঁরা অগ্রসর হবেন?— তবে তাঁদের কিসের মা বলা?...

সবাই মায়ের সন্তান— সকলকে কোলে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন।"

এ-সবের কারণেই তিনি স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ— সমাজ-সংস্কারের

সর্বক্ষেত্রে যুবকদের আহ্বান করে বলেছেন— পণপ্রথার লোভ ত্যাগ করুক বাঙালি শিক্ষিত যুবক—

"কত গরীব মেয়ের বাপ এতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, কত ঘরে বিষাদের ছায়া পড়ে। যদি বলা যায়, ধিক তোমাদের লেখাপড়ায়, আবার দেশ উদ্ধার করতে এসেছ!—অমনি নাকি সুরে বল্‌বে— কি কর্‌ব, বাপমার কথা অমান্য করি কিরূপে, তাঁরা আমার জন্য এত করছেন, ইত্যাদি। আমি তো বলে থাকি— "Every unmarried young man of Bengal is a prospective assassinator of a Snehalata." অশ্বিনীবাবু বল্‌তেন— "এখনকার ছেলেরা কেবল বিবাহের বাজারে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পিতৃ-মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। অনেক বাপ-মাও ছেলের বিবাহ দিয়ে, তার জন্য যা খরচ হয়েছে তা সুদে, আসলে আদায় করবার জন্য ফাঁদ পেতে বসে' থাকেন।"

॥ ৪ ॥

শুধু সমাজ-শিক্ষা-বিজ্ঞান সমস্যা নয়, শুদ্ধ সাহিত্যের বিষয়ও তাঁর একটা নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ছিল। দ্বিতীয় বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের রাজসাহী অধিবেশনে কর্মকর্তারা তাঁকেই সভাপতির আসনে বরণ ..রে নেন। কখনও 'মানসী' পত্রিকায় তিনি লিখছেন বাঙালির দৈহিক অবনতি বিষয় প্রবন্ধ, কখনও লেখেন 'প্রবাসী' তে অসমীরা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা। বাংলাগদ্য সাহিত্যের প্রগতিবিষয়ও তাঁর স্বচ্ছ ধারাবাহিক ধারণা ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ-প্রচারিত মহাভারত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

"এই একখানি গ্রন্থেই তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রহিবে। রাশিরাশি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞানলাভ না হয়, একমাত্র সিংহ মহাশয়ের 'মহাভারত' পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহা আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য

"বাঙ্গালা সাহিত্যের নবযুগের সর্ব্বপ্রধান প্রতিভাশালী সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাইকেল মধুসূদন যেমন কাব্যসাহিত্যের চিরন্তন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এক অভিনব ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া নবভাবের অবতারণ করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ প্রচলিত গদ্য-সাহিত্যকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িলেন।... বঙ্কিমের প্রতিভা যেন স্পর্শমণি; যাহা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই সুবর্ণে পরিণত করিয়াছে।"

নাটকের কথায় লেখেন

"আমাদের জাতীয় গৌরব বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সাত শত বর্ষের পরাধীনতায় আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দধারা বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নাট্যশালা জাতীয় আনন্দ ও সজীবতার নিদর্শন। ইংরাজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিবার পর হইতে তাঁহাদের আদর্শে পুনরায় এদেশে নাট্যশালা স্থাপিত ও নাটক রচনার সূত্রপাত হইয়াছে।"

॥ ৫ ॥

বৈজ্ঞানিক আচার্য রায় যে ভূরি পরিমাণ বাংলা লিখেছেন— তার হদিশ একালের পাঠকদের ক'জন জানেন জানি না। তাঁর জন্মের দেড়শো বছর পূর্তিকালে তাঁর বিজ্ঞানী পরিচয়ের পাশে সামাজিক লেখক ভাবুক প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয়টিও এখনকার জীবনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম। সেটি সন্দীপের কাছে প্রবাহিত করে দেওয়ামাত্রই সে সানন্দে রাজি হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগৃহীত হল গোলপার্ক রামকৃষ্ণমিশন গ্রন্থাগার এবং বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে। পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা লেখাপঞ্চ সংগৃহীত হল। পূর্বপ্রস্তুত গ্রন্থাদির কাছে, সংকলকদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিমেয়— সে কথা সোচ্চারে ঘোষণা করি। পুনশ্চ পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সংকলনের কাজটি করতে গিয়ে মনে হল আচার্য রায়ের এই পঠনশীলতার সূত্রটি কোথায়— তার অনুসন্ধান করা যাক। আচার্যের আত্মজীবনীতেই তাঁর সন্ধান পেলাম। তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় সম্পর্কে তিনি লিখে গেছেন— "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ, হিন্দু পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, তাহার পূর্ববর্ত্তী অমৃতপ্রবাহিনী ও সোমপ্রকাশের তিনি নিয়মিত গ্রাহক

ছিলেন। কেরীকৃত হোলী বাইবেলের অনুবাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা ও রাজাবলী এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস তাঁহার লাইব্রেরীতে ছিল।" তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। গান ভালবাসতেন, বাজাতে পারতেন বেহালা 'ওস্তাদের মত', শিক্ষাবিস্তারে অগ্রগামিতার কারণে স্বগ্রাম বাড়ুলিতে মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন। তাই লিখেছেন— 'বইপড়া অপেক্ষা পিতার সঙ্গে কথা বলিয়া আমরা অনেক বেশি শিখিতাম।' তাই Fieldingএর বইয়ের Country Esquire-এ তাঁর পিতার তুলনা করে গেছেন। শেকসপিয়রের সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ এবং অধিকার ঈর্ষণীয় পরিমাণে ছিল। কলকাতা রিভিউ পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বইপড়াই ছিল তাঁর অবসর বিনোদন। সেই বিনোদন-লব্ধ কালই তিনি জাতীয় কল্যাণ এবং জাতীয় জীবনগঠনের কাজে লাগাবার জন্যেই এই বাণী ও রচনাসম্ভার সমকাল ও উত্তরকালের জন্য রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রশ্ন করেন—

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য?

পুনশ্চ প্রশ্ন করেন—

কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে— পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?

তাঁর আদর্শ ছাত্রসমাজকে উদ্বোধিত, উদ্বেলিত। রবিকবির মনে পড়ে যায় আচার্যের সারা জীবনের সাধনা। আমাদেরও প্রণতি সেখানেই—

—"হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদ গর্জ্জনে
'উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!' ডাক শাস্ত্র-অভিমানিজনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হ'তে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক তা'রা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে— বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!"

কলকাতা
২০১১

বারিদবরণ ঘোষ

সূচিপত্র

॥ প্রথম খণ্ড ॥

বাঙালীর ভবিষ্যৎ	১৭
বিজ্ঞান গ্রন্থপঞ্জী	২৪
বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতা	২৬
বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয়	২৭
মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা	৩০
চীনে ছাত্র আন্দোলন	৩২
বাঙালীর ধ্বংসের কারণ	৩৬
কালিদাসের পাখী	৪০
প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী	৪৫
বাঙলার জমিদারবর্গ (২য়)	৪৮
বাঙলার জমিদারবর্গ (৩য়)	৫০
বাঙলার জমিদারবর্গ (৪র্থ)	৫৪
বাঙলার জমিদারবর্গ (৫ম)	৫৭
চিঁড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট	৫৯
বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান	৬৪
ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে	৭২
ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা	৭২
চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ (১)	৮৩
চা-পান ও দেশের সর্ব্বনাশ (২)	৮৭
রবীন্দ্র প্রয়াণে	৯০
কলেজের ছাত্রদের অপব্যয়	৯১
বস্ত্র-সমস্যা	৯৩
বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল	৯৫
জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়	৯৯

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ	১১৯
বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়	১২৫
অস্পৃশ্যতা ও জাতি-গঠনের অন্তরায়	১৩০
প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র—ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চা	১৩১
প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র—জার্ম্মানী—রসায়ন চর্চ্চার আকর-স্থান	১৩৭
রজনীকান্ত স্মৃতি	১৪৩
চরকা ও বস্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্ত্তব্য	১৪৬
শ্রমের মর্য্যাদা বোধ—বাঙ্গালীর পরাজয় (১)	১৪৮
শ্রমের মর্য্যাদা বোধ—বাঙালীর অন্নসমস্যায় পরাজয় (২)	১৫১
বিহঙ্গকুলের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জ্জন	১৫৪
সুন্দরবনের গণ্ডার লোপ	১৫৫
বিজ্ঞানসভা—পুরাতন ও নূতন	১৫৭
বঙ্গীয় কংসবণিক সম্মেলন	১৫৮
ডিগ্রীর অভিশাপ	১৬২
অন্নসমস্যা ও গোপালন (১)	১৬৭
অন্নসমস্যা ও গোপালন (২)	১৭৪
ম্যাডাম কুরী	১৭৭
পাঠাগারের ব্যবহার	১৮০
পাস্তুয়র ও তাঁহার গবেষণা (১)	১৮১
লুই পাস্তুয়র ও এডওয়ার্ড জেনর (২)	১৮৫
লুই পাস্তুয়র ও তাঁহার গবেষণা (৩)	১৯০
রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার	১৯৪
ভাগাড় হইতে চর্ম্মশালা	১৯৬
হাওড়া মৃতপশুশালা	২০০
বাঁচিবার উপায়	২০৩
হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	২০৫
রত্ন-পরীক্ষা	২০৭
অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আবেদন	২০৯
বাঙ্গালীর দাস মনোভাব—খুলনায় বিজলীবাতি উপলক্ষ্যে	২১১
জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানের শক্তি	২১৩
সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা	২১৫
কলিকাতা ও সহরতলী—৫৪ বৎসর পূর্ব্বে	২১৬
দেশবন্ধু স্মৃতিতর্পণ	২২৩
গিরীশ-সম্বর্দ্ধনা	২২৪
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র	২২৪
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে লিখিত পত্র (১)	২২৫
শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত পত্র	২২৫

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালীর কৃতিত্ব
(১) শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২২৯
(২) কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ ২৩৩
(৩) শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯
জাতিভেদ—হিন্দুসমাজের উপর তাহার অনিষ্টকর প্রভাব ২৪১
পদার্থের চতুর্থ অবস্থা ২৫৮
বস্ত্রশিল্পে বাঙালী—আশার পথে ২৬৩
কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস (১) ২৬৭
কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস (২) ২৭২
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলনের অভিভাষণ ২৭৭
দেশের কর্ত্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দু'টো কথা ২৭৯
সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা ২৮২
রসায়ন শাস্ত্র—নব্য ও প্রাচীন ২৮২
অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা ২৮৫
এখন ও তখন ২৯৪
অন্নসমস্যা— (১) ৩০০
অন্নসমস্যা— (২) ৩০৬
অন্নসমস্যা— (৩) ৩১৩
বিজ্ঞান চর্চ্চা প্রাচীন ও নব্য ভারতে—একনিষ্ঠ সাধনা ৩১৭
বাঁকুড়া শিল্প প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ৩২৩
শিক্ষা ও সেবা ৩২৮
জর্ম্মানীতে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের আদর ৩২৯
পল্লীসমস্যা ও তাহার প্রতিকার ৩৩৩
আমাদের আদর্শ ও কর্ত্তব্য ৩৩৪

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার ৩৩৯
অন্নসমস্যা ৩৫৪
অন্নসমস্যা ও তাহার সমাধান ৩৭২
সমাজ-সংস্কার সমস্যা ৩৭৭
জাতিভেদ ৩৯০
পাতিত্য সমস্যা ৩৯৮
জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের ৪০২
মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তি ক্রয় ৪০৭
সাধনা ও সিদ্ধি (শিক্ষা) ৪১৬

বঙ্গীয় যুবক-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবিকা-অর্জ্জন ৪২১
অর্থনৈতিক সমস্যা—বাঙ্গালী কোথায়? ৪২৬
শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটী কথা ৪৩৪
পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা ৪৪০
অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ ৪৪৫
জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ৪৫১
বাঙ্গালা ভাষায় নূতন গবেষণা ৪৫৭
জাতিভেদ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত ৪৬১
ঘর সামলাও ৪৬৫
বাঙ্গালায় গো-ধনের অভাব ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যনাশ ৪৭৪
বাঙ্গালী—মরণের পথে (অর্থ-নৈতিক সমস্যা) ৪৭৬
চা-পান না বিষপান? (বিবিধ) ৪৮১
পল্লীর ব্যথা (বিবিধ) ৪৮৩

আচার্য্য বাণী

প্রথম খণ্ড

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আজ পঞ্চদশ অধিবেশন। এই অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়া সুবিচার কি অবিচার করিয়াছেন, তা আপনারাই বলিতে পারেন। আমার কিন্তু মনে হয়, এটা অবিচার করাই হইয়াছে। আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র—আপনাদের সভাপতি স্যার মন্মথনাথ এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বোচ্চ আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যখন বাঙলা-সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষদের পাণ্ডা—'সাহিত্যবন্ধু' নলিনীরঞ্জনকে লইয়া আমাকে পাকড়াও করিলেন, তখন স্যার মন্মথনাথের বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়! বয়স এখন আমার সাতাত্তর, শরীর ভাল নয়, বার্দ্ধক্যজনিত জরা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, এই সমস্ত অকাট্য কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও, তাঁহাদের কেহই নিরস্ত হইলেন না। মন্মথনাথ নিরস্ত হন তো, নাছোড়বান্দা নলিনী পণ্ডিত ছাড়েন না। কি করি, অগত্যা আমাকে স্বীকার করিতেই হইল। বিশেষত জীবন-সন্ধ্যায় এতগুলি প্রবাসী ভাইভগিনীর একত্র সমাবেশ দেখিবার সৌভাগ্য আর বোধ হয় আমার হইবে না। আরও আমার একটি দুর্ব্বলতা আছে, কেহ ছাত্র পরিচয় দিয়া উপস্থিত হইলে, তাহার অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না।

ঊনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজসাহীতে যখন আমাকে সভাপতি করা হয়, তখন আমি বলিয়াছিলাম—"আমি একপ্রকার বন্দীভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত হইয়াছি।"—আজও আমার এই অবস্থা। তবে তখন আমার বয়স ছিল আটচল্লিশ, আজ সাতাত্তর। পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তি ও সামর্থ্য অনেক কমিয়াছে। সুতরাং গোড়াতেই বলিয়া রাখি—আমার উপর এই গুরুভার চাপাইয়া, আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন তাহা জানি না। তবে আপনাদের সমবেত সাহচর্য্য ও সহায়তা লাভ করিব, এই ভরসায় এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহস পাইয়াছি।

সাহিত্যদেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্য ভাবেব আদান-প্রদান ও পরিচয়ের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য কাশীমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠান হয়। তারপর এই প্রকার সম্মেলনের উপকারিতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সৃষ্টি। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ও প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন এখনও অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাঙলা-সাহিত্য গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেক উন্নতি করিয়াছে, এই সম্মেলনগুলি সেই উন্নতির সহায়ক। প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে এবং পঠন পাঠন ও আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ডক্টর শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা 'Calcutta Oriental Series' ও 'হৃষীকেশ সিরিজের' প্রবর্ত্তন করিয়া বহু অর্থব্যয়ে গুরু সাহিত্যের (Serious Literature) অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। 'ধনবিজ্ঞানের রূপান্তর', 'পাখীর কথা', 'Pet Birds of Bengal' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শেষোক্ত সিরিজেরই অন্তর্গত।

জাতীয় সাহিত্যই জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। জাতির মানসিক,সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক—জাতীয় সাহিত্য। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের, জাতির সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা পাই।

যে সময়ে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, হাতেলেখা পুঁথির মধ্যে নানা গ্রন্থ ও প্রবাদ বাক্যাদি বিরাজ করিত, সেই অতীত যুগের নানা বিবরণও আমরা আমদের সাহিত্যের ভিতরেই দেখিতে পাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর লেখা রামাই পণ্ডিতের রচিত 'শিবের

গান'-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, বাঙলার চিরন্তন অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধানের কি সুন্দর উপদেশ রহিয়াছে

আম্হার বচনে গোসাঞি তুহ্মি (১) চষ চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।।
পুখরী কাঁদাএ (২) লুইব ভূম খানি।
আরসা (৩) হইলে যেন ছিচএ (৪) দিব পানী।।
আর সব কিষাণ কাঁদিব মথে হাতদিয়া।
পরম ইচ্ছায় দান্য আনিব দাইআ (৫)।।
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।।
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা (৬) বাঘের ছড় (৭)।।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাবে হুগলী নগরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হ্যাল্‌হেড্ সাহেব লিখিত একখানি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফষ্টার সাহেব ইংরাজী-বাঙলা অভিধান প্রকাশ করেন। ইহার প্রকাশক ফেরিস এণ্ড কোং। তাহার পর শ্রীরামপুরে কেরি, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতির চেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় :

১। কেরী সাহেবের অভিধান
২। হিতোপদেশ
৩। বত্রিশ সিংহাসন
৪। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপদিত্য-চরিত্র
৫। কাশীদাসী মহাভারত

এইসমস্ত মহানুভব খৃষ্টান মিশনরিদিগের চেষ্টা ও যত্নে নানাবিধ গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণে প্রকাশিত হইল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদেরই দ্বারা 'দিগ্‌দর্শন' এবং 'সমাচার দর্পণ' বাহির হয়। প্রথমখানি মাসিক পত্র ও দ্বিতীয়খানি দৈনিক সংবাদপত্র। তারপর তাঁহাদের চেষ্টায় বহু বাঙলা-গ্রন্থ শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ (কোন কোন মতে ১৮২৪) হইতে বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি বাঙলায় প্রথম প্রকাশিত হইতে থাকে। ইয়েটস্ (Yates) সাহেবের পদার্থ বিদ্যা-সারের ১ম সংস্করণ ১৮২৫ (১৮২৬) খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে W. Pearce নামক একজন ইংরাজ, J. Lawson-রচিত প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক একখানি ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র মিত্র (ইনি হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন, পরে ঐ কলেজের অধ্যাপক হন) বাঙলায় 'পশ্বাবলী' নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে পশুদিগের বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯/৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অনেকগুলি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিত্র মহাশয় 'পক্ষীর বিবরণ' নামক পক্ষিতত্ত্ববিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য। আশা করি, সুবিখ্যাত বিহঙ্গমতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শ্রীমান্ সত্যচরণ লাহা এই গ্রন্থখানি তাঁহার 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। পরবর্ত্তী কালে, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" (১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদিত "রহস্য সন্দর্ভে" পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রাণিতত্ত্ব ও পক্ষিতত্ত্ব-বিষয়ক এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি দেখিবার যোগ্য।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ইংরাজী ও বাঙলা এই উভয় ভাষায় 'Introduction to the Arts and Sciences' নামক ১২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা

১। তুহ্মি — তুমি। ২। পুখরী কাঁদাএ—পুকুরের পাড়ে। ৩। আরসা — শুষ্ক। ৪। ছিচত্র — সেঁচিয়া। ৫। দাইআ—কাটিয়া। ৬। কেওদা — কেন্দুয়া বা কেউন্দা — ব্যাঘ্র-বিশেষ। ৭। ছড়—চর্ম্ম।

ইংরাজীর অনুবাদ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে Chemistry বা 'কিমিয়া-বিদ্যাসার' প্রকাশিত হয়। ইহার গ্রন্থকার J. Mac পুস্তকখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং ইংরাজী ও বাঙলায় লিখিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে "বস্তুবিচার" (Natural Theology Illustrated) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর ডাক্তার 'কানাইলাল দে প্রণীত 'পদার্থ বিজ্ঞান' নামে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং 'রসায়ন বিজ্ঞান' নামক রসায়নসম্বন্ধীয় একখানি সুবৃহৎ পুস্তক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে শেষোক্ত এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দেই এচ. ই. রস্কো প্রণীত 'রসায়ন সূত্র' (A Primer of Chemistry) প্রকাশিত হয়। আরও কতকগুলি বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম এবং তাহাদের প্রকাশকালের পরিচয় পরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

বিজ্ঞানের মুখপত্র ইংরাজী Nature পত্রিকায় বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রতি সপ্তাহে কত নব নব বিষয়ে কত সুন্দর সুন্দর পুস্তক বাহির হইতেছে! বাঙলায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন পুস্তক বাহির হয় না বলিলেই চলে।

মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সুকুমারমতি বালকগণের জন্য লিখিত আমার 'প্রাণীবিজ্ঞান' ও ১৯০৬ সালে লিখিতে 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' পুস্তক দুইখানি লিখিতে গিয়া আমি এই অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি। এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্য্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি রসায়নের পরিভাষা প্রণয়নে ব্রতী হই। তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে পরিভাষা সঙ্কলনে বিভিন্ন বিভাগের সুধিবৃন্দ আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই।

পরিভাষা সঙ্কলনে আমাদের দেশে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমাদের দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে, এমনকি—একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই পরিভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে। এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে, ইহার একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভয়সিয়ার নব্য রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষৎ (French Academy of Science) যখন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের পরিভাষা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপ তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত যখন অম্লজান, উদজান প্রভৃতি পরিভাষা সৃষ্টি করিলেন, অমনি বাঙলা ভাষার অপর গ্রন্থকারগণ তাহার প্রতিশব্দ দিয়া জলজান, বারিজান প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন।

এইরূপে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন করিলে গুরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃপক্ষে কোনও বিশিষ্ট ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া না চলিলে এ দুরূহ সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে।

পরিভাষা সম্পর্কে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। পরিভাষা কেবল তৈরি করিলেন হইবে না, তাহাকে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া চালাইতে হইবে। গত দশ বৎসর হইতে অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার পৃষ্ঠপোষকতায় "আর্থিক উন্নতি" বাহির করিতেছেন। ইহার মধ্যে অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। তাঁহার প্রণীত "ধন বিজ্ঞান" প্রভৃতি গ্রন্থেও এ প্রচেষ্টা চলিতেছে! নরেন্দ্রনাথ ও বিনয়কুমারের মিলনে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। এসব পত্রিকা ও গ্রন্থের প্রকৃত আদর এদেশে হয় না, ইহা দুঃখের বিষয়।

সুখের বিষয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় যে পরিভাষা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যে সর্ব্বানুমোদিত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবে এ বিশ্বাসও নিঃসন্দেহে পোষণ করা চলে। আমি আশা করি যে, প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিক সুধিবৃন্দ এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবেন। অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের পুত্রপৌত্রগণ বিদেশীয় ভাষার মুখাপেক্ষী না হইয়া বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নব

নব তথ্য পাঠ ও প্রচার করিয়া দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবেন। বাঙলা সাহিত্যের সেই গৌরবময় স্বর্ণযুগ দেখিয়া যাইবার শুভমুহূর্ত হয়ত আমার জীবনে আর আসিবে না।

অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী শিক্ষকতা কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পাইয়াছি, সে সময় আমি বাঙালীর জীবন সমস্যার আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছি। অস্বীকার করিব না—এ আলোচনার ফলে নিরাশা ও দুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে—তাই পত্র হইতে পত্রান্তরে নানা প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় আমি বাঙলার আসন্ন সঙ্কট সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। জীবন-সন্ধ্যায় আজ আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অস্তিত্বের বিনিময়ে বাঙালী সংস্কৃতির গৌরবে আত্মহারা। হায় বাঙালি, তোমার 'মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' সম্বন্ধে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াও কি তোমার জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারিলাম না?

আপন প্রদেশে বাঙালী সন্তানের যে সব সমস্যা—তাহাদের প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দেরও সমস্যা ঠিক তাহাই—বরঞ্চ আরও অনেক বেশী। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষার সমস্যা আছে—ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন আবেষ্টনে জীবনধারণ করিবার সমস্যা আছে। তাই আমি মুখ্যতঃ সাধারণভাবে সমগ্র বাঙালীজাতির কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছি।

১৯০৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আহূত হইয়া আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাঞ্ছিতা ও অপমানিত হইয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিলেন, এবং পুণ্য ইউরোপখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কোপারনিকাস্, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। ১৯০২ সালে প্রকাশিত আমার হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসে "ভারতে-বিজ্ঞান-সাধনা স্পৃহার অবনতি" শীর্ষক অধ্যায়েও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

১৮৭০ সালে পিতার সহিত আমি প্রথম পল্লীভূমি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসি। প্রায় সেই সময়ই জাপানের নবজাগরণ হইল। মাত্র ৬৭ বৎসরের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা-উপশাখায় জাপান যে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের দুই একটি স্থূল উদাহরণই যথেষ্ট হইবে। আজ জাপান আমাদের এই ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর কুচো লোহা ও কাঁচা লোহা বা Wrought Iron কিনিয়া তাহা হইতে ইস্পাত তৈয়ারী করিতেছে এবং সেই ইস্পাত হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কামান, বন্দুক, রণতরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিতেছে ও দেশ বিদেশে বিক্রয় করিয়া রাশি রাশি অর্থ উপার্জন করিতেছে। সম্প্রতি ঢাকা অঞ্চলে একটি কাপড়ের কলের উদ্বোধন করিতে গিয়া দেখিলাম, জাপান হইতে আনীত টাকু (Spindle) ইত্যাদি যন্ত্রে কারখানা আরম্ভ করা হইয়াছে। জাপান আজ বাইসিকেল, নানাবিধ খেলনা, বিবিধ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া শুধু নিজেদের অভাব পূরণ করিতেছে তাহাই নহে—পরন্তু দেশ-বিদেশে চালান দিয়া পৃথিবীর বাজার প্রায় হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে। আমার নিকট জাপান হইতে প্রেরিত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে দেখি, আলকাতরাসঞ্জাত বিবিধ রঞ্জন পদার্থ, বিবিধ ঔষধ ও সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতির ব্যবসায়েও জাপান যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। জাপান আজ নিজের প্রয়োজন মত উড়োজাহাজ তৈয়ারী করিতেছে—বিস্ফোরক তৈয়ারী করিয়া যুদ্ধ করিতেছে! নিরীহ ভারতবাসী আমরা দূরে থাকিয়াও কবিবর হেমচন্দ্রের 'অসভ্য জাপানের' উড়োজাহাজ ও মারণবাষ্পের ভয়ে আতঙ্কিত! কিন্তু আমরা ইউরোপের শাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করিয়াছি রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে; জাপানের অন্যূন ৭০ বৎসর পূর্ব্বে! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজ্ঞান পড়াইবার জন্য পরীক্ষাগার রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন কলেজকে বাধ্য করিয়াছেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত কত পরীক্ষাগারই (Laboratory) না সৃষ্টি হইয়াছে! কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষা তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিবার জন্য! কোন প্রকারেই ইহার কোন ফল দেখা যায় না। সত্য বটে দু'চার জন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এতদিনে মাত্র পঁয়ত্রিশজনও জন্মিল না! এতটুকু দেশ সুইডেন, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক কত না বৈজ্ঞানিকের জন্মভূমি। একা সুইডেনে Linnae, Berzelius, Scheele ও Arrhenius প্রভৃতি কত মনীষীই না জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

দুই-একটি ছাড়া অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে, তোতাপাখির মত মুখস্থ করিয়া পরীক্ষাগৃহে সেগুলি কোন মতে লিখিয়া পরীক্ষা পাশ করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র। এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ৬ হাজার ছেলে আই. এস. সি, ২ হাজার ছাত্র বি. এস-সি ও ৪০০ ছেলে এম. এস. সি. পরীক্ষা দেয়—ইহাদের মধ্য শতকরা কেন হাজার করা একজনও পরবর্ত্তীকালে বিজ্ঞান আলোচনা করে কি না সন্দেহ। বাঙালীর চিত্তবৃত্তির এই নিদারুণ দৈন্যই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধেই এ কথা সত্য তাহা নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও ইহার সত্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। জটিল অর্থনীতিসংক্রান্ত প্রশ্নে বোম্বাইবাসীদের মধ্যে পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, ডেভিড সেসুন এবং মাড়োয়ারী সমাজ হইতে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা প্রভৃতি স্ব স্ব প্রতিভার যোগ্য পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হায়! বাঙালীর প্রতিভার যোগ্য অবদান এক্ষেত্রে কোথায়? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন—"What Bengal thinks to-day the whole of India thinks to morrow"—"বাঙালীর আজিকার চিন্তাধারা কাল সমগ্র ভারত অনুসরণ করিবেই।" প্রসঙ্গতঃ তিনি যে কয়জন কৃতী বাঙালীর নাম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমকক্ষ সেদিন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। আজ দিনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে—"তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

বাঙালীর এই শোচনীয় জীবন সমস্যায় প্রবাসী বাঙালীরও দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কলিকাতা প্রবাসী মাড়োয়ারীগণ পরস্পর সহানুভূতি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ব্যবসার বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। প্রবাসী বাঙালী তাঁহাদের অপেক্ষা শিক্ষা দীক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াও আজ জীবন-সমস্যায় পরাভূত হইতেছেন। তাঁহাদের না গড়িযা উঠিয়াছে ব্যবসার ক্ষেত্র, না গড়িয়া উঠিয়াছে উপার্জ্জনের কোন স্থায়ী পথ। আদিম প্রবাসী বাঙালীগণ সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন—নিঃসংশয়ে বলিব শিক্ষা তাঁহাদের ছিল—ছিল না দূরদৃষ্টি। পূর্ব্বপুরুষগণের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাঁহাদের প্রবাসী বংশধরদেরই করিতে হইবে। বাঙালীর এই দুঃসময়ের জন্য প্রবাসী ভ্রাতাদের দায়িত্ব কত বেশী। সমাজের শিক্ষাগ্রগণ্য সম্প্রদায় প্রবাসে লইয়া আসিলেন দেশের মাটির সম্পূর্ণ ত্রুটিবিচ্যুতি। দেশ হইতে দূরে আসিয়াও তাহার সংস্কারে তাঁহারা কোন চেষ্টাই দেখাইলেন না! এখনও যদি প্রবাসী বাঙালীগণ এ ত্রুটি সংশোধন না করেন, এ কলঙ্কমোচনে অবহিত না হন—তবে বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

অনেকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—অর্থের অভাবেই বাঙালী ব্যবসার ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না—আমি একথা বিশ্বাস করি না। রেল খুলিবার পূর্ব্বে রাজপুতনার মরুভূমি হইতে অশিক্ষিত যে সব মাড়োয়ারী পদব্রজে বাঙলা দেশে প্রবাস-জীবনযাপন করিতে আসিয়াছিল, দিনান্তে সামান্য ছাতুদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বংশধরদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—বিরাট ব্যবসাক্ষেত্র ও প্রভূত অর্থ।

পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙালী বাঙালীর একমাত্র জীবনোপায়—চাকরি বা ওকালতী করিতে বাঙলার বাহিরে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা একটি বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ভুলের ফসলই হইতেছে—তাঁহাদের প্রবাসী বংশধরদের ভীষণ জীবন সমস্যা। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, চিরকালই চাকরি, ওকালতী বা ডাক্তারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ জীবন কাটাইতে পারিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের সকল দিকেই নব জাগরণের উন্মেষ হইল। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রদেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সগর্ব্বে বলিতেছেন যে, ইহা পাঁচটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জননী। ইহা ছাড়াও, আজ অনেক নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বোধ হয় সর্ব্বাধিক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ই এ বিষয়ে সকলের ওপর টেক্কা দিতেছে; অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় কারখানাসুলভ পদ্ধতিতে